ভুমির ওপর অধিকারের প্রশ্ন

চিরকালই সমাজে সঙঘাতের মুখ্য কারন ভূমির প্রশ্নের মধ্যে নিহিত অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভূমির ওপর অধিকার সংক্রান্ত বিরোধই এর জন্যে দায়ী। সেই ঔপনিবেশিক যুগ থেকে অদ্যাবধি ভারতে ভূমি বা জমির ওপর অধিকারের প্রশ্ন হল সেই মুখ্য কারণ যার মধ্যে নিহিত আছে সমাজে নিম্ন স্তরের বিশেষত উপজাতি শ্রেণীর এবং অনগ্রসর বর্ণের মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, প্রান্তিকীকরণ ও বঞ্চনার বিষয়টি। ঔপনিবেশিক যুগের মতই পরবর্তী কালে ওই সমস্যার নিরসন হয়নি। স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তথ্যভিত্তিক আলাপ আলোচনার সুচনা না করে এখনও রাষ্ট্রই জমি অধিগ্রহনের সম্পর্কে একমাত্র সালিশীকারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ঔপনিবেশিক যুগ

এক ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী অতীতে বৃটিশ শাসন কালে বৃটিশরা একটি মধ্যবর্তী শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল যা জমিদার শ্রেনী বলে চিহ্নিত এবং এদের হাতে অর্পন করা হয়েছিল জমির মালিকানা যাতে তারা কৃষক শ্রেণীর থেকে কর আদায় করে তার অধিকাংশ বৃটিশ প্রশাসনের হাতে তুলে তার সামান্য অংশ (১/১১) নিজেদের জন্য রেখে দিতে পারে। কৃষকরা যে জমিতে চাষ করছিল তার মালিকানার অধিকার কখনই লাভ করে নি।

স্বাধীনতা আন্দোলন কাল

কংগ্রেস জমিদারী প্রথা লুপ্ত করার অঙ্গীকার করেছিল এবং সেইমতো ১৯৪৭-৪৯ সালে স্বাধীনতোত্তর ভারতে গণপরিষদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদকল্পে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রক্রিয়া ভারতীয় সংবিধান প্রণীত হওয়ার পুর্বেই শুরু হয়েছিল।১৯৪৯ সালে উত্তর প্রদেশ মধ্য প্রদেশ, বিহার, আসাম ও বম্বে প্রমুখ রাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হয়েছিল। বহুদিন বাদে পশ্চিমবঙ্গ এর অনুসরণ করেছিল। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে এই আইন বলবত হয়।

১৯৪৯ সালের ২রা মে গণ পরিষদে জমিদারি বিলোপ সাধন সংক্রান্ত খসড়া বিলের উপর আলোচনা কালে, সরকার কর্তৃক সার্বজনিক প্রয়োজনে বা সাধারণের কল্যানের জন্য জমি/সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ বিষয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল “ন্যায্য” শব্দটি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী ৭০ বছর ধরে ঐ ‘ন্যায্য ক্ষতিপূরণ’ ও ‘সার্বজনিক প্রয়োজন’ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনা নিয়ে ভূস্বামী/কৃষক এবং রাষ্ট্রের প্রবল মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সেই অর্থে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধনের পরেও এই বিতর্কের মীমাংসা হয়নি। একথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে ভাগচাষী/বর্গাদারদের দ্বারা উৎপাদিত শস্যের ভাগ বিষয়ে ও দীর্ঘকাল যে জমিতে তারা চাষ করে চলেছে সেখান থেকে তাদের উৎখাতকে প্রতিহত করার এক দীর্ঘ কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৪৬-৪৯ সালের তেভাগা আন্দোলনে কৃষক শ্রেণী উৎপাদিত শস্যের তিন ভাগের দু ভাগ তাদের প্রাপ্য বলে দাবী তোলে। কৃষকদের অধিকারে আন্দোলনের তকঙ্কার মতো সর্বোচ্চ দাবী ছিল। পরবর্তী কালে স্বাধীনতোত্তর ভারতে বিভিন্ন

সময়ে নানাবিধ আইন প্রবর্তন এই সমস্যার সমাধানের প্রয়াস অল্পই ফলপ্রশু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর সূচনা হয়েছিল ১৯৫০ সালের জমিদারী প্রথার অবসানকল্পে প্রণীত বর্গা আইন, ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন ও অন্য কিছু আইনের মাধ্যমে। পরে বর্গাদার আইনটিকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন (১৯৫৫) এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সমস্ত আইনগত উদ্যোগ সত্বেও রাজ্য সরকার প্রকৃত ভূমিসংস্কার কার্যকর করতে পারে নি কারণ ভুস্বামী সম্প্রদায় বিভিন্ন বেনামী মালিকানার মাধ্যমে জমি মালিকানার উর্দ্ধসীমাকে এড়িয়ে একে প্রতিরোধ করেছে। ফলস্বরূপ রাষ্ট্র একাধিক কৃষক আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে এবং অবশেষে ১৯৬০ র দশকের শেষভাগে ও ১৯৭০র গোড়ায় দেশে তীব্র নকশালবাড়ি আন্দোলন, যা উত্তরবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু হয়ে পরে তা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমির ওপর অধিকারের প্রশ্নটি এবার জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্যে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল নাগাদ সরকার প্রায় ১০.২৫ লাখ একর খাস জমি চিহ্নিত করেছিল এবং তার মধ্যে ৮.৫৬ একর অধিগ্রহণ করেছিল এবং ৬.২৭ একর জমি ৮.৪৭ লক্ষ পরিবারের মধ্যে পুনর্বন্টন করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনে যুগ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে এবং ভূমি সংস্কারের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১) প্রথমতঃ সরকার বর্গাদারদের উচ্ছেদ করাকে রোধ করার জন্যে ভূমি সংস্কার আইনটি সংশোধন করে ও প্রথমত তাদের নাম জমি রেকর্ডে নথিভূক্ত করে। আইনটির বেশ কয়েকটি সংশোধন করে জমি মালিকের অকৃষিযোগ্য এমন উদ্‌বৃত্ত জমিকে ঐ আইনের আওতায় আনা হয়। এইভাবে পুকুর, ফলের বাগান ইত্যাদিকে ভূমিসংস্কার আইনের আওতায় আনা হল। তদাপি ভূমি বণ্টনের বিষয়টি নানাবিধ অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

স্বাধিনতাত্তোর ভারতবর্ষে প্রথম দশকেই ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়া গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। সরকারের আন্তরিক প্রয়াস সত্বেও খাস জমি চিহ্নিত করে বা সরকার কতৃক সেই জমি অধিগ্রহণ করে তা ভূমিহীন কৃষিমজুরদের মধ্যে পুনর্বন্টন করার জন্য যতো জমির প্রয়োজন সেই তুলনায় উপলব্ধ জমির পরিমাণ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তিন বছর ধরে জমিদারি প্রথা বিলোপ নিয়ে যে বিতর্ক চলে, তাতে জমি বন্টন নিয়ে রাজ্য সরকারের সমস্যাটা সামনে এসে যায়। মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় স্বয়ং এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এটা বুঝতে পারছিলেন যে ভূমিসংস্কার আইনের ফলে রাজ্যে মোট যত পরিমাণ জমি খাস করা সম্ভবপর হবে, তা রাজ্যের রাজ্যের মোট ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি তা সত্বেও মোট খাস জমি রাজ্যের মোট ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সমহারে বন্টন করা হয়, তা হলে এক একজন কৃষকের ভাগে যততুকু জমি জুটবে, তা আদৌ কোনো অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের জন্যে যথেষ্ট হবে না। অন্যদিকে, রাজ্য

সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলের অনুকরণে যৌথ খামার গড়তেও উৎসাহী ছিল না। কারণ, খোদ রাশিয়াতেই ওই মডেল সফল হয়নি। কিন্তু জ্যোতি বাবুর নেতৃত্বাধীন বিরোধীপক্ষ " চাষীর হাতে জমি চাই" নীতিতে অনড় থাকলেন কারণ সমগ্র বামপন্থী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই নীতিকে আদর্শ করে। বামপন্থী দলের এই অবস্থান কার্যকর রূপ নিল যখন ১৯৭৭ সালে তারা ক্ষমতায় এলেন এবং ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবস্থা গ্রহণ করলেন।ফলস্বরুপ ছোটো ছোটো ভাগে অর্পিত জমি ও অধিকৃত জমি (৪-৫ কাঠা,এক বিঘার ১/৪ ভাগ, অথবা এক একরের ১/১২ ভাগ) ভূমিহীণ কৃষকদের মধ্যে পুনর্বন্টন করা শুরু হল।

বামফ্রন্ট সরকারের বহুল প্রশংসিত ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ দুটি গুরুতর সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। ১) বর্গা রেকর্ড অনুসারে জমির মালিক জমি বিক্রয় করতে চাইলে বর্গাদারকে সর্ব প্রথম এই ক্রয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য থাকবেন। এই নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় বৃহৎ- বিশাল পরিমাণ জমি খোলা বাজারের বাইরে রয়ে গেল, তা আর জমি কেনা বেচার পণ্য রইল না। বাজারের থেকে সরিয়ে নেওয়া হল এবং তা আর বিক্রয়যোগ্য পণ্য রইল না। ফলত এইভাবে বাজারের প্রথমিওক শর্তকে অস্বীকার করায় জমির মূল্য কৃত্রিম ভাবে হ্রাস পেল। অনুপস্থিত ভুস্বামীদের পক্ষে তা সমস্যার সৃষ্টি করায় তার কৃষি উৎপাদন বিষয়ে আগ্রহ হারায় ও জমিতে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকে।

২) যেহেতু অনুপস্থিত ভূস্বামীরা ভূমিতে বিনিয়োগ করা বন্ধ করলেন, ফলত যে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র বর্গাদারেরা ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হতে পারতেন, তারা কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার, জলসেচের উপকরণ (পাম্প) ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ক্রমশই অবস্থার চাপে গ্রামের মহাজনদের উপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন কৃষি উৎপাদনের প্রারম্ভিক ব্যয় মেটানোর জন্য। এর ফলে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আর বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতেই পারলেন না এবং অবস্থার ফেরে তা ঐ মহাজনের কাছেই বিক্রয় করলেন যাকে এক কথায় যাকে বিপন্ন বিক্রয় বলা চলে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এমিরেটাস অধ্যাপক বার্বারা হ্যারিস হোয়াইট পশ্চিম বঙ্গের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ গবেষনা করে তার Rural Commercial Capital এ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদিও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য এক প্রগতিশীল উদ্যোগ নিয়েছিল তথাপি দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাই নি কারণ নিজেদের পণ্য তারা সরাসরি বাজারে পৌঁছে দেবার সুযোগ পায়নি। ফড়ে বা দালাল শ্রেণি তাদের নিয়ন্ত্রনে রেখেছে। কৃষিপণ্য চাষির ঘর থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ফড়েদের হাতেই থেকে গিয়েছিল।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা হলে তা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এক সফল পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হবে।

- অবশ্য ভূমির এক সতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্যোতনা রয়েছে। ভূমির স্বত্ব মালিককে একই সঙ্গে নিরাপত্তা ও পরিচিতি দেয়। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই জমির অধিকারী

একজন দরিদ্র মানুষ যেভাবে তার জমিটিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেন তা দেখে। ১৯৭৩-৭৪ সালে লেখক এর প্রমাণ পেয়েছেন নিম্নে উল্লেখিত ঘটনা থেকে।

- ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ডি ভি সি র পাঞ্চেত শহরে একদল সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘেরাও করেছিলেন। এবং ঐ সাঁওতালরা অফিসের সামনে সারাদিনব্যাপী নীরবে অবস্থান চালিয়ে যান এবং তাদের হাতে ছিল সবুজ পতাকা। তাদের কোনো স্লোগান ছিলনা এমনকি কোনো কর্মচারী বা সাধারণ মানূষের ওই অফিসে ঢোকা বা বেরোনোর পথে তারা কোনো অন্তরায়ও সৃষ্টি করেননি। তারা তাদের দিনব্যাপী অবস্থান চালিয়ে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করেন। ১৯৭৪ সালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। পরে এই প্রতিবাদী অবস্থানের কারণ জানা গিয়েছিল যে তারা বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খন্ড) ধানবাদ অঞ্চলে উপজাতিদের অধিকার রক্ষার জন্যে এ কে রায়ের নেতৃত্বাধীন মার্ক্সসিস্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটিকে (এম সি সি) কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে পাঞ্চেত জলাধারে ডিভিসির বাঁধ নির্মানের কারনে আশেপাশের গ্রামগুলি ডুবে যাওয়ায় ঐ সাঁওতাল শ্রেণীর মানুষরা বিস্থাপিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় থেকেই বেশ কিছুকাল ধরে প্রতি বছর তাঁরা ডিভিসির পাঞ্চেত অফিসের সামনে জমায়েত হতেন কতৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যে সরকার এদের যথাযথ পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ডিভিসির পাঞ্চেত জল বিদ্যুৎ প্রকল্পটির উদ্বোধন করেছিলেন। তাঁদের গ্রামগুলি অধিগ্রহণের ১৫ বছর পরেও সাঁওতালরা শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের অপসারণ ও বঞ্চনার বিরোধিতা করেছিলেন।

এই ঘটনাটি কিন্তু ব্যতিক্রমী বলে বিবেচিত হবেনা। ওয়ালটার ফার্নান্ডেজের মতে ১৯৯০ সাল অবধি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৫০০০০০ (পাঁচ লাখ) একর জমি জলসম্পদ প্রকল্পের জন্যেই সরকার অধিগ্রহণ করেছিল। এই সব প্রকল্পের (বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন) জন্যে ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল অবধি কম বেশি ৩৩৮২১৬ জন মানুষকে বিস্থাপিত করা হয়েছিল যার মধ্যে ১৮০৩৮২ ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত ও ১৫০৩১৮ তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ। ওয়ালটার ফার্নান্ডেজ যুক্তি সহ দাবী করেছেন যে, যদিও সরকারী হিসেব অনুসারে জলসম্পদ প্রকল্পের জন্য ৮৬৫৪৭৫ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বলা হয় কিন্তু কার্যতপক্ষে এর পরিমাণ ১২০০০০০ একর এবং সাধারণ সম্পত্তি সম্পদ বলে চিহ্নিত জমি সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না।

- সর্বভারতীয় চিত্রটি একই রকম হতাশাজনক ও যন্ত্রনাদায়ক। পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা গঠিত এক বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী মধ্যভারতে উগ্রপন্থী আন্দোলনের নিরিখে এই উন্নয়ন সম্বন্ধীয় বিষয়টি যাচাই করেছিল।
- সরকারী গবেষণার অভাব হেতু অর্থাৎ সরকারের হাতে যথেষ্ট তথ্য পরিসংখ্যান না থাকায় ওয়ালটার ফার্নান্ডেজের গবেষণা লব্ধ তথ্য ও পরিসংখ্যানই যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটি গ্রহণ করে।যেখানে দেখানো হয়েছে যে ১৯৪৭ থেকে ২০০৪ সাল অবধি যাবতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্যে (বাঁধনির্মাণ, রেলপথ, খনি খনন, ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য কারখানা, রাস্তা নির্মাণ

ইত্যাদি) প্রায় ৬ কোটি মানুষের বিস্থাপিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে ৪০% উপজাতিভুক্ত মানুষ ও ২০% দলিত শ্রেণীভুক্ত। স্মরণে রাখা দরকার যে ভারতে উপজাতিভুক্ত মানুষ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ৮.৬% মানে প্রায় ১০.৪ কোটি এবং এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ যতোটা বিস্থাপিত হয়েছেন তা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে অত্যাধিক বেশি।

ঔপনিবেশিক যুগে জমিকে শাসকরা কর আদায়ের উৎস বলে গণ্য করত। কিন্তু একই সঙ্গে তারা জমিকে ব্যাবহার করত পরিকাঠামো গঠন করার কজে যেমন বন্দর, রেলপথ, বা সড়ক নির্মানের জন্য। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিক কালে দেশের সরকার দ্রুতহারে শিল্পোন্নয়নের জন্যে ব্যাপক হারে ভূমিসম্পদের ব্যাবহার আরম্ভ করেছিল। তৎসহ সরকার প্রায় নামমাত্র মূল্যে শিল্প কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, গুদামঘর, উপনগর গঠন করার জন্য সরকারি জমি প্রদান করতে শুরু করেছিল। সুনিশ্চিত ভাবেই জমির সেই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে গ্রামীণ মানুষের জমি নিয়ে নেওয়া হলো বা তাদের দিয়ে দিতে বাধ্য করা হল।। তপশিলি উপজাতিভুক্ত দলিত ও তপশিলিভুক্ত জাতির মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন (যা ওয়ালটার ফার্নান্ডেজ বলেছেন) সেই কারনেই নকশালপন্থীরা মধ্য ভারতের উপজাতি অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। রাষ্ট্র এই সমস্যার সার্বিক দিকটি না দেখে এটাকে নিছক একটা নিরাপত্তাকেন্দ্রিক সমস্যা হিসআবে দেখেছিল।

এই প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তের ভূমির প্রশ্নের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। নয়া উদারনীতিবাদের সূচনালগ্নেই ৯০র দশকে কর্পোরেট সংস্থাগুলি সরকারের সাথে চক্রান্ত করে SEZ বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামের অন্তরালে জমি দখলের ব্যাপক প্রয়াসে লিপ্ত হয় ।

এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে কৃষক শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, ভাঙ্গড় ও কাটোয়া

উড়িষ্যার কলিঙ্গনগর ও পস্কো (POSCO) অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মান, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ, উত্তরপ্রদেশের দাদরি ও দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় হিংসাত্বক সংঘাত। কৃষক শ্রেণীর তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণে সরকার ১৮৯৪ সালের আদিম ভূমি অধিগ্রহণ আইনের স্থলে নতুন আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়।

 এই নতুন আইনটির নাম ভুমি অধিগ্রহণ আইনে নায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার আইন (Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act) সাধারণের কাছে এটি R & R Act নামে পরিচিত। কৃষকদের অবিরাম বিক্ষোভ আন্দোলনের বাস্তবমুখী সমাধান কল্পে এই আইনটি কাজ করবে বলে মনে করা হয়েছিল। নানাবিধ রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা জমে রয়েছে আদালতে এবং উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও অন্যত্র নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ২০১৪ সালের পাঞ্জাবে এক সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা পরিবেশকে দূষিত করতে পারে বলে কৃষকদের তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলায় ২০১৬ সালে যখন একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল তখন সেখানকার ভূস্বামীরা এক তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন অধিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে। গত বছর মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে

একটি তৈল সংশোধনাগার স্থাপন করার জন্যে রাজ্য পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল ওখানকার মানুষকে উক্ত স্থান থেকে হটানোর জন্যে।

অনায়াসেই বোঝা যায় যে ভিন্ন ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। এই জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে যে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে সেগুলির মূল্যায়ন করা দরকার। যেমন উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের নতুন রাজধানী অমরাবতীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩৩০০০ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বাজার মূল্য অনুযায়ী ওই সুবিশাল ভূখন্ড যে ক্রয় করা সম্ভব নয় একথা রাজ্য সরকার অনুভব করেছিল। সরকার তাই ভূমি একত্রীকরণ ব্যাবস্থার (land pooling system)সহায়তা নিয়ে জনগণের কাছে তাদের জমি তুলনামূলকভাবে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে সরকারকে দান করতে আবেদন করলেন। সিধান্ত হল যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ ভূখন্ডের উন্নয়ন করে কিছুটা অংশ তাদের ফিরিয়ে দিয়ে বাকি অংশ বানিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ রাজধানী অঞ্চল উন্নয়ন কতৃপক্ষ (C R D A)--- অমরাবতী নগর পরিকল্পনা পর্ষদ অনুভব করতে পেরেছিল যে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে ভূমির অধিকার ত্যাগকারী মানুষদেরও যদি উন্নয়নের অন্তর্ভূক্ত করা যায় ও তাদের নায্য প্রাপ্য দেওয়া হয়।

ওই প্রকল্প বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হল যাতে ৩০ দিনের মধ্যে জনগণের এর মাধ্যমে তাদের মতামত বা আপত্তির কথা সরকারকে জানাতে পারে। সরকারী আধিকারিকগণ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যে ভুখন্ডের অংশ প্রত্যার্পন করা হবে তার নকশা, আয়তন ও এলাকা বিষয়ে ওখানকার বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা করেছেন। ভূখন্ডের মালিকেরা স্বয়ং জমির উপবিভাগের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরাসরি আধিকারিকদের সাথে কথা বলে তাদের যাবতীয় সংশয়ের নিরশন করতে পারবেন সেই ব্যবস্থা রাখা হবে। আপাত দৃষ্টিতে CRDA বা অন্ধ্র প্রদেশ রাজধানী অঞ্চল উন্নয়ন কতৃপক্ষ খুব গুরুত্বের সঙ্গে এই গণ প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করে তাদের সুপারিশ গুলি পরিবর্তিত পরিকল্পনার কাজে লাগিয়েছিল।

এর ফলস্বরূপ এই প্রকল্প ঘোষনা হবার চার মাসের মধ্যে ২৪টির মধ্যে ২২ টি গ্রাম তাদের জমি অর্পন করতে রাজী হয়েছিল। এরপর প্রত্যার্পনযোগ্য ভূখন্ডগুলিকে বৈদ্যুতিন লটারির মাধ্যমে বন্টিত করা হয়েছিল ন্যায্যতা বজায় রাখার জন্যে। এই লটারি প্রক্রিয়া আয়োজিত হয়েছিল গ্রামের মধ্যেই এবং মোবাইল ফোনে প্রেরিত মেসেজের মাধ্যমে জমির প্রাপকদের সেকথা সুনিশ্চিত ভাবে জানানো হয়েছিল। জমি বন্টনের যাবতীয় সরকারী বরাদ্দপত্র ওইখানেই ছেপে ততক্ষনাৎ তাদের হাতে অর্পন করা হয় এবং অনলাইনে বৈদ্যতিন মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখা হল।

একথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে (প্রখ্যাত সমাজতাত্বিক ও আইনবিষয়ক গবেষণাকারী কল্পনা কান্নাবিরানের দাবী অনুযায়ী) যে ভূখন্ডের অধিকারীগণ এগিয়ে এসে স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে ভুখন্ড অর্পণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই অনুপস্থিত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের। এখনো বিরোধের মীমাংসা হয়নি। তাই যখন কিছু মানুষ এর বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ল্যান্ড পুলিং ব্যাবস্থার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন তখন তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল R & R Act বা ভুমি অধিগ্রহণ আইনে নায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার আইনের সহায়তায়।

- গুজরাটে এই ল্যান্ড পুলিং ব্যাবস্থা কিছুটা সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে উক্ত দুই রাজ্যেই (অন্ধ্র প্রদেশ ও গুজরাট) জনসংখ্যা পশ্চিম বঙ্গ বা কেরালার তুলনায় কম। অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ ও কেরালার তুলনায় ওই দুই রাজ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্‌বৃত্ত জমির পরিমাণ অনেক বেশী।

এবার পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি অঞ্চলের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে যেখানে কয়লা খনি স্থাপনের জন্য সরকারের এক প্রকল্পের বিরোধিতা করছে উপজাতি (মূলত সাঁওতাল) সম্প্রদায়ের মানুষ।

- বীরভূম জেলার দেউচা পাচামি অঞ্চলে সরকারী অনুমান অনুযায়ী ওখানে ভারতের সর্বাধিক বৃহৎ কয়লা সম্পদ ও ব্যাপক পরিমাণে ব্যাসাল্ট শিলার ভান্ডার রয়েছে।
- প্রায় ২১০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ১২টি গ্রাম যার এলাকা ৩৪০০ একর সেটিকে বেঙ্গল বীরভূম কোলফিল্ড কোম্পানি অধীনে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই জনসংখ্যার অধিকাংশই তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। ঐ অঞ্চলের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন কারন সরকার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে ২০০৬ সালে প্রণীত বন অধিকারের স্বীকৃতি আইন অনুসারে গ্রাম সভার পূর্ব সম্মতি নেবার কোনো প্রয়াসই করেনি।
- মমতা ব্যানার্জির সরকার এক্ষেত্রে প্রবল সমস্যার সম্মুখীন কারণ তারা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছেন। সরকার দাবী করছে যে তারা বলপ্রয়োগের মাধমে জমি অধিগ্রহণের বিরোধী। অথচ পুলিশ ও শাসক দলের ক্যাডারদের সহায়তায় রাজ্য প্রশাসন যেনতেন উপায়ে স্থানীয় মানুষদের তাদের জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য করছে।
- অবশ্য রাষ্ট্রও নতুন রেল পথ বা সড়ক নির্মাণের জন্য নতুন জমি অধিগ্রহণ আইনকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে বল্‌প্রয়োগকেই ক্ষমতাকেই একমাত্র নির্ধারক হিসাবে ব্যবহার করছে।

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমির অধিকারের বিবিধ ধাঁচ রয়েছে কাজে কোনো একটি মডেলকেই সমস্ত রাষ্ট্রের জন্যে কাজে লাগানো যাবে না।

আরেকটি উদাহরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাগরপাট্টার ঘটনা। পুণার রেল স্টেষন থেকে সাত কিলোমিটার দূরে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল যেখানে কৃষকেরা নিজেদের জমি রিয়েল এস্টেটের মাধমে তার উন্নয়ন সাধন না করে জমি পুলিং ব্যবস্থার সহায়তায় একটি ছোটো উপনগরী গঠন করেছিলেন। ওখানকার ঐ গোষ্ঠির নামেই উপনগরীর নামকরণ করা হয়েছিল। একটি কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে উপনগরীটি গঠিত হয়েছিল এবং জমি হস্তান্তকারী সকল কৃষকই তার অংশীদার ছিলেন। এখানে একটি বানিজ্যিক কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, এমনকি শপিং মল স্থাপিত হল এবং তদুপরি অঞ্চলের ৩০% শতাংশ এলাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছি সবুজ বৃক্ষাদি রোপনের জন্যে। একথা লেখক দাবী করছেন না যে সেটাই ছিল আদর্শ মডেল। সম্ভবত এটিকে গরীব ও

অসহায় কৃষকদের জন্যে জমি হাঙ্গরদের হাত থেকে জমি রক্ষার উদ্দেশ্যে ও তাদের অন্ন সংস্থানের জন্যে একটি বিকল্প মডেল হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে।

জমি বস্তুটি এক অর্থে অভিনব। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সাথে জমি বা ভূমি সম্পদের পরিমাণ অপ্রতুলতাও বেড়ে চলেছে। যাবতীয় রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে জমি বিষয়ক বিরোধ বা উৎপন্ন কৃষি পণ্যের উপর অধিকার সম্বন্ধীয় লড়াই। আধুনিক ভারতে এটা কখনো মাথা চাড়া দেয় উগ্রপন্থী আন্দোলনের রূপ নিয়ে (যেমন মধ্য ভারত) আবার কখনো তীব্র কৃষক আন্দোলনের চেহারা নেয় (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হারিয়ানা বা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মতো)। ২১ শতকের প্রথম দশকে ভারতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে কর্পোরেট আর সরকার হাত মিলিয়ে জমি দখল করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল তার বিরুদ্ধে নানাবিধ ধরনের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল।

কৃষি জমি ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়টি কয়েকটি ব্যাপারের উপর নির্ভলশীল।

- বিক্রেতা কি মূল্য প্রত্যাশা করছেন
- ক্রেতা যে ধরনের দামকে যথাযথ বলে মনে করছেন ইত্যাদি
- অন্যান্য ব্যাপার যেমন সাংস্কৃতিক বিষয় জড়িত থাকতে পারে। জমিকে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়।
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকতে পারে

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৭৮ সালে পশ্চিম বাংলার বাম ফ্রন্ট সরকার জমিতে চাষরত সমগ্র ভাগচাষীদের নাম নথিভূক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল যাদের, চুক্তির ভিত্তিতে জমির মালিকরা নিয়োগ করেছিল তাদের জমি চাষ করার জন্য। জমি মালিকরা যাতে ভাগ চাষীদের যখন খুশি জমি থেকে উৎখাত করতে না পারে তা রোধ করার জন্য।

এই ব্যবস্থার নাম ছিল অপারেশন বর্গা

এই ব্যবস্থা প্রচলনের ফলস্বরূপ জমি বিক্রয়কালে মালিককে সর্বপ্রথম তার ভাগ চাষীকে ঐ জমি ক্রয় করার প্রস্তাব দিতে হবে। তিনি কিনতে রাজি হলে (অবশ্যই স্বল্প মূল্যে) তাকে জমি বিক্রি করা ছাড়া জমি মালিকের আর কোনো উপায় থাকবে না।

কাজেই বাস্তবিক ক্ষেত্রে অপারেশন বর্গার কারনে বাংলায় অধিকাংশ কৃষি জমি ভূমি বাজারের পরিধির মধ্যে আর থাকলো না।

অনুপস্থিত জমি মালিকরা যে কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা নির্মানের জন্যে তাদের জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল কৃষক ও ভাগ চাষীরা যাদের জীবন নির্বাহ হত জমিকে কেন্দ্র করেই। মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে গড় কৃষি জমি মালিকানা মাত্র ০.৭৭ হেক্টর যেখানে এর পরিমাণ তামিলনাড়ুতে ০.৮৩ হেক্টর গুজরাতে ১,৪৯ হেক্টর আর অন্ধ্র প্রদেশে ১,০৬ হেক্টর।

দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষের জমির অধিকারের বিষয়টি গত ৭০ বছর ধরে ক্রমশই দূর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাকে দৃঢ়তর রূপ দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে।

- এগুলি হল পঞ্চায়েতসমূহ (PESA আইন বা তপশীলি অঞ্চল আইন ১৯৯৬ এর আয়ত্তাধীন করা হয়েছে)
- অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬ এবং
- ভুমি অধিগ্রহণ আইনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতা পুনর্বাসন আইন ২০১৩ (যা R & R Act 2013 নামে পরিচিত) কিন্তু কেবল এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ এগুলির কার্যকরিতা পর্যাপ্ত নয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষক শ্রেনীর মানুষ যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে ও দাবী করছে যে নূন্যতম ক্রয় মূল্যে তাদের পণ্য সরকারকে তাদের বাজার থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে কিনতে হবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

এককথায় দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে নানাবিধ বিকল্প মডেল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রয়োগ করা চেষ্টা হয়েছে যাতে কৃষি জমিকে বাণিজ্যিক, শিল্প স্থাপন ও নগরায়নের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য ধরনের মডেল থাকতে পারে। কিন্তু সেই মডেলের সাফল্য সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ভাবে নির্ভর করবে যদি জমির মালিককে ঐ উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে অংশীদার করা হয় তার ওপর। কিন্তু এই নীতি বাস্তবে প্রযুক্ত হয়নি।

রাষ্ট্র ও কর্পোরেট দুনিয়া আগ্রাসী দৃষ্টিতে ভূমির প্রশ্নটিকে উন্নয়নের (যেমন শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পরিকাঠামো গঠন) উপকরণ হিসেবে তাদের অধিগ্রহণের অধিকার হিসেবে গণ্য করছে। অথচ দরিদ্র মানুষ এর কুফল ভোগ করছে ও তাদের উপায়ন্তর প্রায় নেই। রাষ্ট্র মনে করে যে এই অধিগ্রহণ জন কল্যান হেতু তাই একে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসেবে দেখতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে একে যাচাই করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতে দুই বেঞ্চ বিচারকের এক উল্লেখ যোগ্য রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা কোলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বনাম বিমল কুমার শাহ ও অন্যান্যদের মামলায় রায় দিয়ে ছিলেন যে কেবল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমেই রাষ্ট্র কতৃক বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের নায্যতা প্রমাণ হয়না যদি না ের সাথে প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সাবধান করে বলা হয়েছিল যে সম্পত্তির অধিকার ক) জনস্বার্থের জন্যে অধিগ্রহণ খ) ক্ষতিপূরণ প্রদান কেবল মাত্র দুটি শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আরো অর্থবহ উপায়ের কথা মনে রাখতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ

সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায় এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। ৮/১ সংখাগরিষ্ঠের রায় সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ৫ই নভেম্বর ২০২৪ এ উল্লেখ করেছে যে সংবিধানের ৩৯বি ধারাবলে যাবতীয় ব্যাক্তিগত সম্পত্তিকে সমাজের বস্তু সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার তা অধিগ্রহণ করে পূনর্বন্টন করতে পারে না । বিভিন্ন নিম্ন আদালতে

দীর্ঘ মামলা চালনোর পর সম্পত্তির মালিকদের সংগঠন ও অন্যন্যরা ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতে একটি লিভ পিটিশন (আবেদন) দাখিল করেন মহারাষ্ট্র সকারের বিরুদ্ধে।

এখানে দাবি করা হয় যে মহারাষ্ট্র সরকার শহর অঞ্চলের বহু পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় সম্পত্তি জনস্বার্থের নাম করে ১৯৭৬ সালে প্রনীত মহারাষ্ট্র আবাসন ও অঞ্চল উন্নয়ন আইনের সাহায্যে অধিগ্রহণ করতে চাইছে। আশ্চর্যের কথা এই মামলায় অন্যপক্ষরাও সামিল হয়েছিল যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাদের মামলা ছিল ১৯৫৫ সালে প্রনীত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ও তদপরবর্তী ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালে কৃত সংশোধনী গুলির সাংবিধানিক বৈধতা বিষয়ক।

- ঘোষিত মহারাষ্ট্র আবাসন ও অঞ্চল উন্নয়ন আইনের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইন মারফত বিবৃত করা হয়েছিল যে উক্ত আইন প্রনীত করা হয়েছে যাতে সংবিধানের ৩৯ নং ধারায় খ) ও গ) উল্লেখিত নীতি অনুসারে রাষ্ট্র ঐ নীতি রূপায়ন করতে পারে।
- তৎকালীন প্রধান ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচুড়ের নেতৃত্বে বেঞ্চের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যেমন ন্যায়াধীশ হৃষীকেশ রায়, ন্যায়াধীশ জে বি পারদিওয়ালা, ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্র, ন্যায়াধীশ রাজেশ বিন্ডাল, ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্র শর্মা, ন্যায়াধীশ অগাস্টিন জর্জ মাশি ন্যায়াধীশ বি ভি নাগারত্না এতে সম্মতি দিয়েছিলেন কেবল ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন।
- ঐ বেঞ্চ তাদের সামনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিবেচনা করেছিল যেমন বস্তুতান্ত্রিক সম্পদ, জনহিত, পূনর্বন্টন ইত্যাদির সংজ্ঞা কি? এরপর তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ঐ বেঞ্চ আরো মন্তব্য করেছিল ঃ

সংবিধানে উল্লেখিত ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং ধারাগুলি রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্গত এবং এদের প্রয়োগ কালে রাষ্ট্রের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখতে হবে এবং নিছক যান্ত্রিক আইনি কাঠামো বলে এর ব্যখ্যা করা চলবে না। ভারতের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির গতিময়তাকে স্মরণে রেখে এর নমনীয় ব্যখ্যা ও অর্থ নির্নয় করতে হবে যাতে জনসাধারণের কল্যান ও প্রগতিকে সুনিশ্চিত করা যায়।

উপরি উক্ত ধারা গুলির এবং সংবিধানের অন্যান্য ধারা গুলিকে আদালত এক ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের রায় প্রদান করার সময়।

উপসংহার

- কতকগুলি প্রশ্ন উথ্যাপন করা যেতে পারে। ঐ ৯ বিচারপতিদের বেঞ্চ তাদের রায় প্রদান করার পূর্বে নিশ্চিতভাবে তাদের পুর্ববর্তী বেঞ্চগুলি প্রদত্ত রায়গুলি বিচার করে দেখেছেন। তাদের মধ্যে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের মামলার কথা আসে। এই বেঞ্চ তাদের রায়ে ঐ রায়ের কিছু সমালোচনা করেছেন। কি ভাবে তারা এটা

যুক্তিসম্মত বলবেন। সর্বোপরি আইনের ব্যাখ্যার ভিন্নতা বর্তমান। তাই জনহিতকারী, সাধারণ বস্তুতান্ত্রিক সম্পদ বা ব্যাক্তিগত সম্পত্তির সংজ্ঞাও পাল্টে যেতে পারে।

- সমগ্র আইন ব্যাবস্থার ইতিহাস তা প্রমাণ করে। ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছিল কারন ততদিনে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ধারণার ধাঁচটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই আমরা আশা করতে পারি যে অদুর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বাধ্য হবে আরো জনকল্যানমুখী আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হবে যাতে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় ও তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

References:

1. Fernandes, Walter, 2012. *Progress, at Whose Cost? Development-Induced Displacement in West Bengal 1947-2000*, North Eastern Social Research Centre, India.

2. Barbara Harris White, 2007. *Rural Commercial Capital: Agricultural Markets in West Bengal*, OUP, India.

3. Ratan Ghosh and K Nataraj, "Land Reforms in West Bengal, Social Scientist, Vol.6, No.6/7, Special Number of West Bengal (January- February 1998) pp.50-67

4. Anandabazar Patrika

5. Supreme Court Judgment, 5 November, 2024

Author: *Rajat Roy is a member of the Calcutta Research Group and a Senior Journalist with wide experience in both Print and Electronic media. He started his journalistic career under two legendary journalists Gourkishore Ghosh and Hamdi Bey, when Aajkaal, a Bengali daily was launched in 1981. Later on, he joined Anandabazar Patrika. During his 18 years stay in Anandabazar Patrika he shouldered various responsibilities, such as, member of Delhi bureau, Chief of Delhi bureau, Chief Reporter (West Bengal districts), News Coordinator, News Editor and Associate Editor (Editor). He has been associated with CRG's Research Programme of "Justice, Security and Vulnerable Populations of South Asia" in 2024. This publication is a part of the Research.*